# গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

## (Abstract)

১৩৭৪ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'দেশব্রতী' সংখ্যায় চারু মজুমদার বলেছিলেন – 'ভারতবর্ষে আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই এদেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব মানে কৃষি বিপ্লব। ভারতবর্ষের সমস্ত সমস্যা জড়িত রয়েছে এই কাজের ওপর।' এই বক্তব্যটি নিয়ে তর্ক হতেই পারে, কিন্তু এই কথাটি অস্বীকার করা যাবে না, যে এখনও গ্রামীণ জীবনের সত্তর শতাংশ মানুষ তাদের জীবনধারণের জন্য কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অথচ পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে আজ পর্যন্ত কৃষি সমস্যা একটি অমীমাংসিত সমস্যারূপেই প্রতিভাত হয়ে এসেছে। ঔপনিবেশিক কাল থেকেই কৃষকদের চরম শোষণ করা হয়েছে। ফলে নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য তারা প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কৃষক সমাজ বারেবারেই বিভিন্ন আন্দোলনে সামিল হয়েছে। যদিও সচেতন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার অভাব, পরিণত নেতৃত্বের অনুপস্থিতি এই সময়ের কৃষক আন্দোলনগুলিকে সংহত ও দৃঢ়বদ্ধ করতে সফল হয়নি।

অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর কৃষক আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও সংগঠিত রাজনীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও কৃষকেরা প্রধানত তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষ্যেই এই সমস্ত বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছে। আমাদের গবেষণাক্ষেত্রের সীমার মধ্যে নিহিত 'তেভাগা আন্দোলন' (১৯৪৬–৪৭ খ্রিস্টাব্দ)। এই প্রথম কৃষকেরা পূর্বতন বিচ্ছিন্ন আন্দোলনের ভাবনা থেকে সরে এসে একটি রাজনৈতিক দলীয় ভাবনার ছত্রছায়ায় এসে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হলেন। ফসলের দুই তৃতীয়াংশের অধিকারের জন্য তেভাগার দাবি ছিল অবিভক্ত বাংলার শেষ বড় কৃষক আন্দোলন। এই আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী কোনো ফল কৃষকরা ভোগ না করলেও

সাময়িকভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিকল্প প্রশাসন ব্যবস্থা ও সালিশি আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা এসেছিল। যদিও প্রায় কিছুই বাস্তবায়িত হল না। জোতদার ও মজুতদারদের প্রতি প্রতিষ্ঠিত সরকারের তোষণনীতি ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত করতে শুরু করল। তার ফলশ্রুতিতে ঘটল ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন। শাসকশ্রেণির সঙ্গে জনগণের দূরত্ব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ২৫ শে মে, ১৯৬৭ সালে শিলিগুড়ির অদূরে নকশালবাড়িতে ঘটে যায় কৃষক পুলিস সংঘর্ষ; যা নিশ্চিতভাবেই দুই শ্রেণির মধ্যে জমে থাকা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বঞ্চনারই বহিঃপ্রকাশ। জমির লড়াইকে কেন্দ্র করে কায়েমি স্বার্থের প্রতি বিরোধিতাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। মূলত রুদ্ধ অর্থনীতিই এই বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে। যদিও শেষপর্যন্ত নকশালদের এই কৃষি বিপ্লব জমির জন্য লড়াইকে অস্বীকার করে, গণ আন্দোলনের দায়িত্ব থেকে সরে এসে 'শ্রেণিশত্রু খতম' করার প্রয়াসে উপস্থিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে তেভাগা থেকে নকশালবাড়ি অর্থাৎ চার দশক ব্যাপী সময়কালের মধ্যে বাংলায় ঘটে যাওয়া এই কৃষক আন্দোলনদুটির সাধারণ স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই আন্দোলনগুলি সাময়িকতা ও হঠকারিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত। ফলে কোনো ক্ষেত্রেই এই আন্দোলনগুলি কৃষকদের বিশেষত ভাগচাষি ও ক্ষেতমজুরদের প্রকৃত অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই তেভাগা থেকে শুরু করে নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন পর্যন্ত কৃষক আন্দোলনের বিবর্তন তথা কৃষক জীবনের চাওয়া–পাওয়া–ক্ষোভ–বঞ্চনা–যন্ত্রণা–আশা–আকাঙ্ক্ষার সংগ্রামের ইতিবৃত্তের দৃষ্টান্ত বাংলা কথাসাহিত্যে বিরল নয়। সেই সুনির্দিষ্ট পরিসরকে স্মরণে রেখেই কৃষক বিদ্রোহ এবং কৃষক জীবন সম্পৃক্ত উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলির বিশ্লেষণ , সমালোচনা ও মূল্যায়নের প্রয়াস এই গবেষণাকর্মটি। এই বিশেষ ভাবনার প্রকাশ বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে অপ্রতুল নয়।

মূলত নির্বাচিত কথাসাহিত্যের প্রেক্ষিতেই এই গবেষণা কর্মের পরিধিটিকে সীমিত রাখা হয়েছে।

## প্রথম অধ্যায়

# বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের স্বরূপ

যে কোনো কৃষক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে আমরা শোষণের ইতিহাসকেই খুঁজে পাব। বাংলাদেশে কৃষক বিদ্রোহের একটি ধারাবাহিক ঐতিহ্য থাকলেও অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। এই সময়ের কৃষক বিদ্রোহের ক্ষেত্রে কৃষক শ্রেণির নিজস্ব দাবি পূরণের পাশাপাশি বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি এবং এই শাসনের ফলে গড়ে ওঠা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রবণতাই এই পর্বের কৃষক বিদ্রোহগুলির মূল বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর কৃষক আন্দোলনগুলি সংগঠিত রাজনীতির আশ্রয়ে সংঘটিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই সময়ের কৃষক আন্দোলনগুলিকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ), অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১–২২ খ্রিস্টাব্দ) এবং আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০–৩৪ খ্রিস্টাব্দ)– এ কৃষকেরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। তবে কংগ্রেসী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা আর একটি সংগঠিত রাজনীতির ক্ষেত্রকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে সেটি হল বামপন্থী রাজনীতি। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ায় 'নিখিল বঙ্গীয় প্রজা' সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন থেকেই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সাম্যবাদী ভাবনা মিশে গেল। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরের দ্বিতীয়

অধিবেশনে তৈরি হল ‘ বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল’। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সময় কমিউনিস্ট, কংগ্রেস সোশালিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা মিলে ‘সর্বভারতীয় কৃষক সভা’ গঠন করলেন। ত্রিশ চল্লিশের দশকের সন্ধিক্ষণে কয়েকটি স্থানীয় কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বও দেয় কৃষক সভা।

কৃষক স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য সামগ্রিক গ্রহণযোগ্য একটি কর্মসূচি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতিত্বে একটি ভূমি রাজস্ব কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশনই প্রথম ‘তেভাগা’-র দাবি সুপারিশ করে। এরপর ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা’-র যশোর জেলার পাঁজিয়াতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ‘তেভাগা’–র দাবি তোলা হয়। এরপর ১৯৪৬–৪৭ খ্রিস্টাব্দে ‘তেভাগা’ আন্দোলন শুরু হয়। ‘আধি নয় তেভাগা চাই’ অর্থাৎ ফসলের দুই তৃতীয়াংশের অধিকারের জন্য ‘তেভাগা’–র দাবি অবিভক্ত বাংলার শেষ বড় কৃষক আন্দোলন। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশ বিভাজনের পরও বিভিন্ন এলাকায় ‘তেভাগা’ – র দাবিতে লড়াই চলতে থাকে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পিছু হঠা এবং আন্দোলনের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হওয়ায় ১৯৪৭–৪৮ খ্রিস্টাব্দ ও তার পরবর্তী বছরগুলিতে ‘তেভাগা’–র লড়াই পরাস্ত হতে থাকে। ‘তেভাগা’ –আন্দোলনকে কোনোভাবেই বৈপ্লবিক বলা যায় না। কৃষকদের জন্য জমির দাবি একটি দূরের লক্ষ্যবস্তুরূপেই থেকে যায়।

‘তেভাগা’–র পর কিছু সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ‘বর্গাদার আইন’ পাশ হয়, ‘জমিদারি অধিগ্রহণ’ আইন হয় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে হয় ‘ভূমি সংস্কার’ আইন। ষাটের দশকের শেষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে সবথেকে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল খাদ্য সংকট। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ‘খাদ্য আন্দোলন’, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে–এর নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এলো। কিন্তু এই সরকারের দুর্বলতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন

ঘটল না। এই অসহায় অবস্থার মধ্যে নকশালবাড়ি কৃষক সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। কায়েমি স্বার্থের বিনাশ ঘটানোই নকশালবাড়ির উদ্দেশ্য ছিল। যদিও সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। গণ আন্দোলন ও গণ সংগঠনের মাধ্যমে প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস কার্যত অপরিবর্তিতই থেকে গেল। এক শোষণহীন সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে গেল।

নকশালবাড়ির পঞ্চাশ বছর পরেও ভারতীয় তথা বাংলার কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম, সেচ ও ঋণের সুবিধার স্বপ্ন দেখে চলেছে। নতুন কোনো আন্দোলনের পথ ধরে হয়তো এই স্বপ্ন একদিন সার্থক হবে। ভবিষ্যতই এর উত্তর দেবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

## তেভাগার সংগ্রাম : বাংলা উপন্যাস

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক কালপর্বটি নানা কারণে স্মরণীয়। এই দশকে আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মন্বন্তর, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষের সবথেকে বড় কৃষক আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ ও স্বাধীনতা।

আমাদের গবেষণা কর্মের এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি তেভাগা – কেন্দ্রিক আটটি উপন্যাস। গুণময় মান্নার ‘লখীন্দর দিগার’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘লালমাটি’, সাবিত্রী রায়ের ‘পাকাধানের গান’, মহাশ্বেতা দেবীর ‘বন্দোবস্তি’, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বজনভূমি’, সেলিনা হোসেনের ‘কাঁটাতারে প্রজাপতি’ ও ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’ এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ‘খোয়াবনামা’। সময়ের হিসাবে পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বিস্তৃত এই উপন্যাসগুলির রচনাকাল। ‘তেভাগা’ আন্দোলনের গুরুত্ব বিচারে উপন্যাসের সংখ্যা খুবই

অপ্রতুল। বাংলাদেশের অধিকাংশ মধ্যবিত্ত লেখক গোষ্ঠী 'তেভাগা' আন্দোলনের সঙ্গে মানসিকভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেননি বলেই মনে হয়। প্রত্যক্ষ কৃষক নেতৃত্বের ভূমিকা বা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাসগুলিকে নির্মাণ করার প্রয়াসও সবক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না। কমিউনিস্ট ভাবনায় বিশ্বাসী যুবক শ্রেণির অনুভবেই এই উপন্যাসগুলি মূলত রচিত হয়েছে। তবে ব্যতিক্রম আছে। গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসদুটিতে কৃষকের চোখ দিয়ে আন্দোলনকে অনুভব করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের নিরন্তর জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার খোয়াব নির্মাণে ঔপন্যাসিক অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী।

'তেভাগা' আন্দোলনের পরবর্তীকালে রচিত এই উপন্যাসগুলি আন্দোলনের গতিপথ নির্ণয় না করলেও পরবর্তীকালের সাহিত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন অভিমুখ তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

## তৃতীয় অধ্যায়

## তেভাগার সংগ্রাম : বাংলা ছোটগল্প

'তেভাগা' আন্দোলন শুধুমাত্র একটি কৃষক আন্দোলন রূপে নয়, জীবনকে নতুন করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্যও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আমরা চব্বিশটি গল্প নিয়ে আলোচনা করেছি। গল্পগুলির প্রকাশের কালসীমা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই কালের ব্যবধানের ফলে আন্দোলনের প্রায় সমসাময়িক কালে রচিত গল্পগুলিতে যে প্রত্যক্ষতা লক্ষ করা যায়, পরবর্তীকালের গল্পে সেই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ স্বরূপ

স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত। অভিজ্ঞতার আলোকে অতিক্রান্ত সময়ের দর্পণে অতীতকে শুধু নির্মোহ দৃষ্টিতে অনুভব করা যায়।

গল্পগুলি প্রত্যেকটি যে শিল্পগত তাৎপর্যে সার্থক হয়ে উঠেছে তা নয়। একটা বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে গল্পের শিল্পরস অনেক সময়ই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবুও গল্পগুলি প্রতিবাদের, প্রতিরোধের।

## চতুর্থ অধ্যায়

# নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থান : বাংলা উপন্যাস

জনমানসে স্বাধীনতা যে বিশাল প্রত্যাশার দাবি জানিয়েছিল বাস্তবে তা পূর্ণতা পেল না। অসন্তুষ্ট অসহায় মানুষের কাছে তখন রুদ্ধ অর্থনীতি আর ভ্রষ্ট রাজনীতি। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস। আমরা মোট দশটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছি। সত্তরের দশক থেকে শুরু করে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত উপন্যাসগুলির রচনাকাল বিস্তৃত। সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে রূপান্তরিত করার জন্য যে গভীর বিশ্বাস আর স্বপ্ন ছিল তা নিয়েই উপন্যাসগুলি রচিত হয়েছে। যদিও একথা বললে খুব ভুল বলা হবে না যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লেখক গোষ্ঠী খুব কমক্ষেত্রেই নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় কৃষক আন্দোলন তথা কৃষকের ভূমিকাকে যথার্থরূপে ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ থেকেছেন নকশাল আন্দোলনে বিশ্বাসী যুবক যুবতীদের উপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চিত্র অঙ্কনে।

এই অধ্যায়ে আলোচিত উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে আমরা আমাদের গবেষণার মূল ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সীমিত পরিসরে মূলত কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত উপন্যাসগুলিকে বেছে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। তবে পাশাপাশি এই আন্দোলন কিভাবে যুবক শ্রেণিকে শেষপর্যন্ত একটি হতাশা এবং বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল, সেই ধরনের ইঙ্গিতবাহী উপন্যাসের স্বরূপকেও প্রকাশ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

আমাদের আলোচিত উপন্যাসগুলি হল –

১. স্রোতের সঙ্গে – নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

২. গ্রামে চলো – স্বর্ণ মিত্র।

৩. অসংলগ্ন কাব্য – অসীম রায়।

৪. মহাকালের রথের ঘোড়া – সমরেশ বসু।

৫. শ্যাওলা – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

৬. অপারেশন বসাই টুডু – মহাশ্বেতা দেবী।

৭. এভাবেই এগোয় – জয়ন্ত জোয়ারদার।

৮. কালবেলা – সমরেশ মজুমদার।

৯. একটি আত্মহত্যা ও কয়েকজন নকশাল – বেণু দাশগুপ্ত।

১০. দ্রোহজ – সুপ্রিয় চৌধুরী।

## পঞ্চম অধ্যায়

# নকশালবাড়ি কৃষক অভ্যুত্থান : বাংলা ছোটগল্প

নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছোটগল্পগুলি এক বিপন্নতার কথা বলে। আন্দোলনের কর্মীদের উপর সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের যে বিভীষিকা তা বহু গল্পেই ফিরে

ফিরে এসেছে। যে ছাত্র ও যুবকশ্রেণি বিপ্লবের উন্মাদনায় ভেসে গিয়ে গ্রামে গিয়েছিল কিংবা খতমের রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছিল শেষপর্যন্ত এক চরম হতাশায় তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভাবনা আর তার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে থেকে গেছে সুদূর পার্থক্য। এর প্রকাশ ঘটেছে এই পর্বের গল্পগুলিতে। এই অধ্যায়ে আমরা মোট তিরিশটি গল্প নিয়ে আলোচনা করেছি। গল্পের শিল্পরূপ নির্মাণে সব লেখকেরাই যে সফল তা বলা যাবে না। তবে অনেকেই তাঁদের বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় ও পক্ষপাতদুষ্ট হলেও গল্পের নির্মাণ ও রসপ্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো সমঝোতা করেননি।

আসলে সবটাই ক্ষমতা দখলের লড়াই। সাধারণ মানুষ প্রাণ দেয়, প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্রোহদমনে। কৃষকের অধিকার লঙ্ঘিত হতেই থাকে। তবুও স্বপ্নটা থেকে যায়। একটা পাল্টে দেওয়ার স্বপ্ন। এটাই বাঁচিয়ে রাখে অন্য কোনো নতুন আন্দোলনের জন্য।

# উপসংহার

বিংশ শতাব্দী থেকে সাম্যবাদী চেতনার বিস্তার, কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিতি কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাসের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা বহুলাংশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লেখক শ্রেণিকে কৃষকদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল। এর পিছনে সক্রিয় ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পালাবদলের বাস্তব স্বরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকেই সাম্যবাদে বিশ্বাসী, সমাজতান্ত্রিক চেতনার দ্বারা আলোড়িত একদল সাহিত্যিক এই প্রত্যয়ে ঋদ্ধ হলেন যে, প্রগতিশীল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন শ্রমিক কৃষক শ্রেণির নবজাগরণ। ফলত এই সময় থেকেই কৃষক–শ্রমিক

তথা নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিবাদের ভাষা কথাসাহিত্যের ভাষা হিসেবে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে। মধ্যবিত্ত লেখক গোষ্ঠী এই অর্থনৈতিক–রাজনৈতিক সংকটে জিইয়ে রাখা কৃষি সমস্যা ও দরিদ্র কৃষিজীবীদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করলেন তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে।

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত মানুষের তেভাগাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আন্দোলন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিরূপ মনোভাবকে কাটাতে তেভাগা প্রভাবিত সাহিত্যের একটা বড় ভূমিকা ছিল। আর নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখার মধ্যে একটা চেতনা আমরা বারে বারেই লক্ষ্য করেছি, যা আমরা তেভাগা কেন্দ্রিক লেখায় পাই না, তা হল আত্মসমালোচনা এবং আত্মবিশ্লেষণের ভাবনা।

উত্তাল সত্তরের পর কেটে গেল আরো পাঁচটি দশক। কৃষকের উন্নতির গতি আজো স্থবির। প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে স্বৈরতন্ত্রকে জিইয়ে রেখেছেন। তবে ভারতবর্ষ নতুন করে আর একটি শান্তিপূর্ণ কৃষক আন্দোলনের সাক্ষী হয়েছে। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের পথই হয়তো একদিন সার্বিক উন্নয়নকে প্রতিষ্ঠিত করবে। নতুন করে স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে।